সপ্তম অধ্যায়

শব্দ প্রমাণ

পাঠ্য বিষয় ঃ প্রমাণরূপে 'শব্দের' সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ। (a) ঈশ্বর সংকেত ও পদ-পদার্থ-সম্বন্ধরূপে 'শক্তি' (সাক্ষাৎ অর্থবোধক শক্তি)। (b) শক্তি কি সামান্যধর্ম (universal) অথবা বিশেষধর্ম (Particular) এ-বিষয়ে মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের মধ্যে বিতর্ক। (c) 'অর্থ-সম্বন্ধ' কিভাবে জানা যায়? (d) অর্থ কি ব্যবহার-ভিত্তিক বিষয়—এ বিষয়ে মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের মধ্যে বিতর্ক। (e) লক্ষণার (অসাক্ষাৎ অর্থ-বোধক শক্তির) বিশ্লেষণ এবং তার তিনটি প্রকার। (f) গৌণী-বৃত্তি (পদের গৌণ অর্থ-বোধক শক্তি) বিশ্লেষণ। (g) শক্তি অথবা লক্ষণার প্রকাররূপে 'ব্যঞ্জনা-বৃত্তি'। (h) লক্ষণা-বীজ-তাৎপর্য সক্রান্ত প্রশ্ন। (i) অসম্পূর্ণ বাক্য প্রসঙ্গে সমস্যা। প্রাভাকর ও নৈয়ায়িকদের মধ্যে বিতর্ক। (j) 'যোগ-রূঢ়ী'র প্রত্যয়। 'শাব্দবোধে'র তিনটি শর্ত—আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধি বিশ্লেষণ। দু'প্রকার বাক্যের মধ্যে পার্থক্যকরণ—বৈদিক ও লৌকিকবাক্য। 'শব্দ' কি অনুমানের অন্তর্গত—বৈষেষিক ও নৈয়ায়িকদের মধ্যে বিতর্ক।

৭.১. তর্কসংগ্রহ ঃ আপ্তবাক্যং শব্দঃ। আপ্তস্তু যথার্থবক্তা। বাক্যং পদসমূহঃ ; যথা—গামানয় শুক্লাং দণ্ডেনেতি।

অনুবাদ ঃ আপ্তব্যক্তি কথিত বাক্যকে 'শব্দপ্রমাণ' বলে। যিনি বাক্যের যথার্থ অর্থ জানেন এবং তদনুরূপ বাক্য বলেন তাঁকেই 'আপ্ত' বলা হয়। 'বাক্য' বলতে বোঝায়, 'একসঙ্গে উচ্চারিত পদসমূহ'। যেমন—'দণ্ডের দ্বারা শ্বেতবর্ণা গাভীটিকে আনয়ন কর'।

তর্ক দীপিকা ঃ শব্দং লক্ষয়তি—আপ্তেতি। বাক্যং লক্ষয়তি—বাক্যমিতি।

৭.১. ব্যাখ্যা ঃ

(ক) ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায় 'শব্দ'কে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করে না। যেমন, —চার্বাক, বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শনে শব্দ-প্রমাণ স্বীকৃত হয়নি।

চার্বাক মতে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। শাব্দজ্ঞান কখনো প্রত্যক্ষ-নির্ভর, কখনো আবার অনুমান-নির্ভর। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-নির্ভর হলে শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গণ্য করা যাবে না। আবার, শাব্দজ্ঞান অনুমান-নির্ভর হলে শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলা যাবে না, কেননা চার্বাক মতে অনুমান প্রমাণ নয়, অনুমিতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ-নির্ভর। কাজেই, তথাকথিত সমস্ত প্রমাণের মূলে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। শব্দ প্রমাণ নয়।

তবে, চার্বাক বলেন যে, 'শব্দ প্রমাণ নয়' একথার অর্থ এমন নয় যে, 'শব্দ কোন ক্ষেত্রেই জ্ঞানদানে সমর্থ নয়।' যেসব ক্ষেত্রে শব্দ প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থকে নির্দেশ করে, সেসব ক্ষেত্রে শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকার করতে হয়, অন্যথায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, লোকব্যবহার, ব্যবহারিক জীবনে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হতে পারে না,—যেমন, বাক্যে (বাক্য = শব্দ-সমূহ) প্রকাশিত একের (যেমন-চার্বাকের) মতবাদ অপরের কাছে অর্থবহ হতে পারে না। 'আগুন উত্তপ্ত', 'জল শীতল'—এজাতীয় ক্ষেত্রে শব্দ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয়ের নির্দেশক হওয়ায়, এসব ক্ষেত্রে শব্দকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রমাণরূপে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে

শব্দ প্রত্যক্ষের অগোচর অলৌকিক বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত হয়, যেমন বেদে উল্লিখিত 'ধর্ম-অধর্ম', 'পাপ-পুণ্য' ''ঈশ্বর', 'অদৃষ্ট' প্রভৃতি শব্দ যখন ইন্দ্রিয়াতীত অলৌকিক বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখন শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকার করা চলে না।—এটাই হল শব্দ-প্রমাণের বিরুদ্ধে চার্বাকের অভিযোগ।

বৌদ্ধগণ দুপ্রকার পদার্থের উল্লেখ করেন—**স্বলক্ষণ** ও **সামান্য-লক্ষণ**। তৃতীয় প্রকার অন্য কোন পদার্থ বৌদ্ধদর্শনে স্বীকৃত হয়নি। স্বলক্ষণ পদার্থকে জানা যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে ; সামান্য-লক্ষণ পদার্থকে জানা যায় অনুমান প্রমাণের মাধ্যমে। শব্দ-প্রমাণ-গ্রাহ্য তৃতীয় কোন পদার্থ না থাকায়, বৌদ্ধমতে, শব্দ কোন প্রমাণ নয়। তবে, এক্ষেত্রেও 'শব্দ কোন প্রমাণ নয়' একথার অর্থ হল, স্বলক্ষণ ও সামান্য-লক্ষণ পদার্থ অতিরিক্ত তৃতীয় কোন পদার্থকে যদি কোন শব্দ বোধিত করে, তাহলে সেই শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকার করা যাবে না ; কিন্তু শব্দ যদি **প্রত্যক্ষগ্রাহ্য** অথবা **অনুমানগ্রাহ্য** কোন পদার্থকে বোধিত করে, তখন সেই শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকার করতে হবে, অন্যথায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ, লোকব্যবহার, কথা-বার্তার মাধ্যমে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় ইত্যাদি সম্ভব হবে না। বৌদ্ধদর্শনে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণরূপে স্বীকৃত হয়েছে।

বৈশেষিক মতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান অতিরিক্তভাবে শব্দকে প্রমাণরূপে গণ্য করলে 'গৌরবদোষ' ঘটে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের দ্বারা যদি সমুদয় যথার্থজ্ঞানের বা প্রমার ব্যাখ্যা সম্ভব হয়, তাহলে, 'লাঘবে'র খাতিরে, শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গণ্য করা নিষ্প্রয়োজনীয়। বৈশেষিক মতে শব্দকে যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণের অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করা যায়, তেমনি আবার ক্ষেত্রবিশেষে অনুমান প্রমাণের অন্তর্গতরূপেও গণ্য করা চলে। কাজেই, শব্দ কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়। শব্দকে প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করে সমুদয় যথার্থ-জ্ঞানের ব্যাখ্যা করা যায়।

(খ) ন্যায় মতে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান প্রমাণের মতো 'শব্দ'ও একটি প্রমাণ। 'শব্দ' হল প্রমাণ আর ঐ প্রমাণলব্ধ জ্ঞান হল 'শাব্দবোধ' বা 'শাব্দজ্ঞান।' ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গৌতমকে অনুসরণ করে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন 'শব্দে'র অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণের লক্ষণ প্রকাশ করে বলেছেন, 'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ' অর্থাৎ আপ্তব্যক্তির উপদেশ প্রকাশক বাক্যই হচ্ছে শব্দ প্রমাণ। নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট গৌতমকে অনুসরণ করে 'শব্দে'র লক্ষণ প্রকাশার্থে বলেছেন, 'আপ্তবাক্যং শব্দঃ'—**আপ্তব্যক্তির বাক্যই হল শব্দ প্রমাণ।**

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত 'শব্দে'র লক্ষণটির অর্থবোধের জন্য লক্ষণের অন্তর্গত 'আপ্ত' এবং 'বাক্য' শব্দ দুটির অর্থ জানা প্রয়োজন।

'আপ্ত' শব্দের অর্থ ঃ

যিনি যথার্থ বক্তা তিনিই আপ্তব্যক্তি। যথা + অর্থ = যথার্থ। **যিনি শব্দ দ্বারা বোধিত অর্থকে অর্থাৎ পদার্থকে যথার্থভাবে জানেন এবং সেই যথার্থ অর্থ প্রকাশের অভিপ্রায় বশত জ্ঞানানুরূপ বাক্য বলেন, তিনিই 'আপ্ত' এবং এমন সত্যদ্রষ্টা এবং সত্য প্রকাশক ব্যক্তির বাক্যই হল 'আপ্তবাক্য'।** এজন্যই, অন্নংভট্ট আপ্তব্যক্তির লক্ষণ প্রকাশ করে বলেছেন, 'আপ্তস্ত

যথার্থবক্তা'। ভ্রান্ত, প্রমত্ত বা উন্মত্ত ও প্রবঞ্চকের বাক্য শব্দ প্রমাণ নয়। যিনি বাক্যের অন্তর্গত শব্দসমূহের অর্থ বিষয়ে ভ্রম, প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ প্রবঞ্চনাশূন্য হয়ে বাক্য প্রয়োগ করেন, এমন ব্যক্তিই আপ্ত বা যথার্থ বক্তা। পরমেশ্বর ও তত্ত্বদর্শী বেদজ্ঞ ঋষিগণ **সর্ববিষয়ে** ভ্রম, প্রমাদ ও প্রবঞ্চনাশূন্যরূপে 'আপ্ত'। সাধারণ মানুষ **অংশবিশেষে** আপ্ত, সর্ববিষয়ে নয়। 'যিনি যে বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য, তিনি সেই বিষয়ে আপ্ত, অন্য বিষয়ে নয়। এজন্য পিতা-মাতাকে পুত্রাদির হিত সম্বন্ধে, চিকিৎসককে রোগ সম্বন্ধে, গুরুকে তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে, এবং বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞান সম্বন্ধে 'আপ্ত' মানা হয়'।[১] সার কথা হল—যিনি (সর্ববিষয়ে যথার্থ জ্ঞানী অথবা অংশবিশেষে যথার্থজ্ঞানী, এমন পুরুষ) বাক্যের অন্তর্গত শব্দের অর্থ সমূহকে অর্থাৎ পদার্থ সমূহকে প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা যথার্থরূপে জানেন এবং ইচ্ছাবশত (করুণাবশত) অপরকে সেই জ্ঞানে উপদিষ্ট করার জন্য বাক্য প্রয়োগ করেন, এমন ব্যক্তিই যথার্থ বক্তা বা 'আপ্ত' এবং এমন ব্যক্তির উচ্চারিত শব্দই শব্দ-প্রমাণ।

'বাক্য' শব্দের অর্থ ঃ

'বাক্যে'র লক্ষণ প্রকাশার্থে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন, 'বাক্যং পদসমূহঃ' এবং বাক্যের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করেছেন, 'গাম্-আনয় শুক্লাং দণ্ডেনেতি, 'যার অর্থ হল, ''বাক্য' বলতে বোঝায়, একসঙ্গে উচ্চারিত বা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদসমষ্টি, যেমন—'দণ্ডের দ্বারা (ভয় দেখিয়ে) শ্বেতবর্ণা গাভীটিকে নিয়ে এসো'। অন্নংভট্ট বাক্যার্থজ্ঞানের হেতুরূপে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, সন্নিধি ও তাৎপর্যকে উল্লেখ করে বলেছেন, 'পরস্পর আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি যুক্ত পদসমূহই বাক্য'। যে বর্ণ বা যে পদ বিনা যে শাব্দবোধের জনক হয় না, সেই বর্ণের পরে সেই বর্ণ বা সেই পদের পরে সেই পদই আকাঙ্ক্ষা'।[২] বাক্যার্থ এই চারটি শর্ত-নির্ভর। যেমন—

আকাঙ্ক্ষা ঃ বাক্যস্থিত পদসমূহকে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে হয়, না হলে বাক্যটি অর্থপূর্ণ হয় না। যেমন—'গোরু ঘোড়া হাতি মানুষ' কোন বাক্য নয়, যেহেতু এক্ষেত্রে অর্থ প্রকাশের জন্য চারটি পদের পূর্বাপর অর্থবোধক হতে পারেনি। কিন্তু 'গরুটি আনয়ন কর' একটি বাক্য, কেননা অর্থবোধের জন্য এখানে তিনটি পদের প্রত্যেকটি অন্যটির পরে প্রয়োজনীয়। **বাক্যস্থিত পদ-সমূহের এই প্রকার পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তাই হল আকাঙ্ক্ষা।**

যোগ্যতা ঃ অর্থবোধের অভাব হল অযোগ্যতা এবং তার বিপরীত অভাবের অভাব হল যোগ্যতা। কাজেই বাক্যস্থিত পদসমূহের বাধের অভাবই যোগ্যতা। অর্থবাধ থাকলে শাব্দবোধ হয় না এবং ফলত বাক্যটি থেকে যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 'বাধ' অর্থে 'অসঙ্গতি'। পদসমূহের অর্থের মধ্যে অসংগতি থাকলে বাক্যটির অর্থবোধ হতে পারে না। 'জল দ্বারা স্নান করবে', এই বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন শব্দের অর্থের মধ্যে কোন বাধ বা অসঙ্গতি না থাকায় বাক্যটি যথার্থ জ্ঞানের জনক হয় ; কিন্তু 'অগ্নি দ্বারা স্নান করবে' বাক্যটিতে 'যোগ্যতা'র অভাব অর্থাৎ অর্থবাধ থাকায় বাক্যটি শুনে কোষ যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

সন্নিধি ঃ বাক্যস্থিত পদগুলির অবিলম্বে উচ্চারণ বা স্মরণ হচ্ছে সন্নিধি। 'গাভী আনয়ন কর', এই বাক্যস্থিত শব্দগুলিকে যদি অযথা বিলম্ব না করে উচ্চারণ বা স্মরণ করা হয়, তাহলে

১. তর্কসংগ্রহ। পৃঃ ১৮১। নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী।
২. তর্কসংগ্রহ। পৃঃ ১৫৯-৬০। শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী।

বাক্যটি থেকে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে ; কিন্তু প্রত্যুষে 'গাভী', মধ্যাহ্নে 'আনয়ন' এবং সায়াহ্নে 'কর' শব্দ উচ্চারণ বা স্মরণ করলে উচ্চারিত বা স্মৃত শব্দ থেকে কোন যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না।

তাৎপর্য ঃ বাক্যের অর্থ অনেক সময় বক্তার ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের ওপর নির্ভর করে। এপ্রকার ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ই হল 'তাৎপর্য'। **যে বিশেষ অর্থ প্রকাশের অভিপ্রায়ে বক্তা বাক্যস্থিত পদ ব্যবহার করেন, সেই বিশেষ অর্থই হল তাৎপর্য।** যেমন, 'দণ্ড গ্রহণ কর' বাক্যটির সঠিক অর্থ নিরূপণের সময় জানা প্রয়োজন কোন্ অভিপ্রায়ে বক্তা 'দণ্ড' শব্দটি ব্যবহার করেন। বক্তার অভিপ্রায় যদি 'লাঠি' অর্থ হয়, তাহলে বাক্যটির অর্থ হবে, 'লাঠিটি গ্রহণ কর', আর বক্তার অভিপ্রায় যদি 'শাস্তি' অর্থ হয় তাহলে বাক্যটির অর্থ হবে, 'শাস্তি গ্রহণ কর।

অন্নংভট্টের মতে, এসব শর্ত-সমন্বিত পদসমষ্টিই হল বাক্য।

❑ ৭.২. 'পদের লক্ষণ

তর্কসংগ্রহ ঃ শক্তং পদম্। অস্মাৎ পদাৎ অয়মর্থো বোধব্য ইতি ঈশ্বর-সংকেতঃ শক্তিঃ।

অনুবাদ ঃ যা পদার্থ নিরূপিত শক্তির আশ্রয়, তাকেই 'পদ' বলে। 'এই পদ থেকে এই অর্থ বোধিত হোক'—এপ্রকার ঈশ্বরসংকেত বা ইচ্ছাকেই বলে 'শক্তি'।

তর্কদীপিকা ঃ পদলক্ষণমাহ—'শক্তম্' ইতি। অর্থ-স্মৃতি অনুকূল-পদার্থ-সম্বন্ধঃ শক্তিঃ। সা চ পদার্থান্তরম্ ইতি মীমাংসকাঃ। তন্নিরাসার্থমাহ—'অস্মাৎ' ইতি। ডিত্থাদীনামিব ঘটাদীনামপি সংকেতঃ এব শক্তিঃ, ন তু পদার্থান্তরমিত্যর্থঃ।

৭.২. ব্যাখ্যা ঃ

৭.২.(ক) 'পদের' লক্ষণ

'বাক্যে'র লক্ষণ প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন, 'বাক্যং পদসমূহ'—'বাক্য' বলতে বোঝায় 'সার্থক পদসমষ্টি।' বস্তু বা বিষয়কে বোঝাবার জন্য যে পদের শক্তি থাকে, তাই হল 'সার্থক পদ'। এখন প্রশ্ন হল,—**'পদ' কাকে বলে? পদের লক্ষণ কী?** পদের লক্ষণ প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন, **'শক্তং পদম্'**। 'শক্তং' শব্দের অর্থ 'শক্তিবিশিষ্ট। 'শক্তি' হল 'সামর্থ্য'—এখানে 'জ্ঞানোৎপাদন সামর্থ্য'। 'ঘট', 'পট' প্রভৃতি শব্দের প্রত্যেকের এক বা একাধিক অর্থে শক্তি থাকার জন্যই তারা প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ বস্তুকে বোধিত করে। এজন্য 'ঘট', 'পট' প্রভৃতি হল 'পদ'। 'ঘট' পদের দ্বারা পট পদার্থ বোধিত হয় না ; তেমনি 'পট' পদের দ্বারা ঘট পদার্থ বোধিত হয় না। এর কারণ হল, পদের সঙ্গে তার অর্থের অর্থাৎ পদার্থের এক বিশেষ সম্বন্ধ আছে। **বিশেষ পদের সঙ্গে বিশেষ অর্থ-সম্বন্ধকেই অন্নংভট্ট দীপিকাতে 'শক্তি' বলেছেন**—'অর্থ-স্মৃতি-অনুকূল-পদার্থ-সম্বন্ধঃ শক্তিঃ।'

শক্তিরূপ সম্বন্ধের একটি সম্বন্ধী হল পদ, আর অন্য সম্বন্ধী হল অর্থ বা পদার্থ। একটি সম্বন্ধীর জ্ঞান হলে, নিয়ম অনুসারে, অন্য সম্বন্ধীর স্মরণ হয়। 'শক্তিরূপ সম্বন্ধের সম্বন্ধী শব্দের জ্ঞান হলে অন্য সম্বন্ধী অর্থের স্মরণ হয়। শাব্দবোধ স্থলে এই স্মরণকে **'উপস্থিতি'** বলে।'[১] শ্রুত শব্দের ক্রম অনুসারে শ্রোতার অর্থবোধ হয়। যেমন, 'ভূতলে ঘট আছে' শোনার পর

১. তর্কসংগ্রহ। পৃঃ ১৬০-৬১। শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী।

শ্রোতার মনে ক্রমে ক্রমে 'ভূতল' শব্দ থেকে 'আশ্রয়স্বরূপ ভূতলের', 'ঘট' শব্দ থেকে 'কম্বুগ্রীবাদি-বিশিষ্ট ঘটের', 'আছে' শব্দ থেকে 'অস্তিত্বে'র এবং আকাঙ্ক্ষাবশত তাদের ক্রমানুসারে সম্বন্ধের জ্ঞান উপস্থিত হয়। **এ-প্রকার শাব্দবোধের 'করণ' হল 'শব্দ-জ্ঞান'**, আর **স্মৃতিপটে অর্থের বা পদার্থের উপস্থিতি হল 'ব্যাপার'। পদার্থের উপস্থিতির অনুকূল পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ-বিশেষই হল শক্তি।**

৭.২.(খ) শক্তির স্বরূপ

শক্তির স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন, 'অস্মাৎ পদাৎ অয়ম্ অর্থঃ বোধব্য ইতি ঈশ্বর-সংকেতঃ শক্তিঃ'—**'এই পদ থেকে এই অর্থ বোধিত হোক্'—ঈশ্বরের এমন ইচ্ছা বা সংকেতই হল শক্তি'**। অবশ্য তর্কসংগ্রহে অন্নংভট্ট ঈশ্বরের ইচ্ছাকে (ঈশ্বর-সংকেতকে) শক্তিরূপে গণ্য করলেও দীপিকাতে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, **'অর্থ-স্মৃতি অনুকূল পদার্থ-সম্বন্ধঃ শক্তিঃ'** অর্থাৎ শক্তি হল একটি পদ ও তার অর্থের এমন এক সম্বন্ধ যা ঐ অর্থটিকে স্মরণ করায়। দীপিকায় এপ্রকার ভিন্নমত পোষণ করার কারণ সম্ভবত মীমাংসকদের অভিমতের বিরোধিতা না করা। মীমাংসা দর্শনে বেদোক্তরূপে ঈশ্বরের উল্লেখ থাকলেও, মীমাংসকগণ জগৎকর্তারূপে ঈশ্বর মানেন না এবং সেজন্য শক্তিকে ঈশ্বর-সংকেতরূপে মানতে পারেন না। সম্ভবত মীমাংসক অভিমত স্মরণে রেখেই অন্নংভট্ট দীপিকাতে শক্তিকে একপ্রকার **'সম্বন্ধ'** বলেছেন, (তা ঈশ্বর-সংকেত' না হতেও পারে) যা স্বীকার করতে মীমাংসকদের কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

অবশ্য 'শক্তি'কে 'সম্বন্ধ'রূপে গণ্য করা গেলেও মীমাংসক অভিমতের সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক অভিমতের তত্ত্বগত স্বরূপ সম্বন্ধে পার্থক্য অপনীত হয় না, কেননা মীমাংসক শক্তিকে পদের **সহজাতশক্তি** বলেন, আর ন্যায়-বৈশেষিক শক্তিকে **পদ-বহির্ভূত** শক্তি বলেন। মীমাংসক মতে, শক্তিরূপ সম্বন্ধ পদের সহজাত হলেও তা **পদ থেকে স্বতন্ত্র**। শক্তি যেমন দ্রব্য পদার্থ নয়, তেমনি আবার গুণ পদার্থও নয়। **শক্তি হল এক স্বতন্ত্র পদার্থ—শক্তি পদ নিহিত হলেও তা এক স্বতন্ত্র পদার্থ**—দ্রব্য পদার্থ এবং গুণ পদার্থ থেকে স্বতন্ত্র পদার্থ। পক্ষান্তরে, ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় মতানুসারে, শক্তিরূপ সম্বন্ধ (পদ-পদার্থ-সম্বন্ধ) সাতটি স্বীকৃত পদার্থ* অতিরিক্ত নতুন কোন পদার্থ নয়। শক্তিরূপ সম্বন্ধ পদের সহজাত বা অন্তর্নিহিত কোন কিছু নয়, তা সম্পূর্ণরূপে পদ-বহির্ভূত এবং সংকেত বা ইচ্ছা অনুসারে তা এক একটি পদে আরোপিত হয়।

দীপিকাতে অন্নংভট্ট শক্তিরূপ সম্বন্ধকে 'ঈশ্বর-সংকেত রূপে উল্লেখ না করলেও 'সংকেত'রূপে গণ্য করে বলেছেন, 'ডিত্থাদি-নাম-ইব ----সংকেত এব শক্তিঃ'—' ডিত্থ ইত্যাদি ব্যক্তিবাচক নামের মূলে হল কোন সচেতন পুরুষের ইচ্ছা বা সংকেতরূপ শক্তি'। প্রকৃতপক্ষে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে শক্তিকে 'ঈশ্বর-সংকেতরূপে গণ্য করে প্রাচীন নৈয়ায়িকদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন, আর দীপিকাতে শক্তিকে 'সংকেত এব শক্তি'রূপে গণ্য করে নব্য নৈয়ায়িকদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। **প্রাচীন মতে, ঈশ্বরের ইচ্ছাই হল শক্তি, নব্য মতে ইচ্ছাই শক্তি।** অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে প্রচীন মতের উল্লেখ করেও দীপিকাতে নব্যমতের উল্লেখ করার হেতু হল,

* বৈশেষিকদর্শন-সম্মত সাতটি পদার্থ হল—(১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম, (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ, (৬) সমবায় ও (৭) অভাব।

ঈশ্বর-সংকেতের পরিবর্তে কেবল **সংকেতের** উল্লেখ করলে 'ইচ্ছা-মাত্রকেই'—সে ইচ্ছা যেমন ঈশ্বরের হতে পারে, তেমনি মানুষের হতে পারে—শক্তিরূপে গণ্য করে আধুনিক শব্দের, নতুন নতুন পরিভাষার, অর্থ ব্যাখ্যা করা চলে—কেবল ঈশ্বর-সংকেতকে শক্তিরূপে গণ্য করলে ঈশ্বর কর্তৃক জগৎ-সৃষ্টি লগ্নের কয়েকটি মাত্র শব্দের জগতে—'চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা' ইত্যাদি শব্দের জগতে, আবদ্ধ থাকতে হয়।

আধুনিক নামবাচক শব্দের পশ্চাতে ঈশ্বর-সংকেত বা ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে না, থাকে ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছা। যেমন, কোন সূত্রধর একটি কাষ্ঠ নির্মিত হস্তিবৎ পদার্থ নির্মাণ করে যদি এমন ইচ্ছা (সংকেত) প্রকাশ করেন যে, "হস্তিবৎ পদার্থটি 'ডিত্থ' নামে চিহ্নিত হোক", তাহলে ঐ 'ডিত্থ' নামেই পদার্থটি দর্শকের কাছে পরিচিত হয়। তেমনি, পিতা-মাতার ইচ্ছা অনুসারে সন্তানের নামকরণ হলে, সেই ব্যক্তিবাচক নামেই (শব্দেই) সন্তানটি অপরের কাছে পরিচিত হয়। তেমনি আবার দেখা যায় যে, বিজ্ঞানী কোন নতুন তথ্য আবিষ্কার করলে অথবা দার্শনিক কোন নতুন তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হলে বিশেষ কোন নামের দ্বারা সেই তথ্য বা তত্ত্বকে চিহ্নিত করেন এবং পণ্ডিতমহলে সেই সেই নামেই তা পরিচিত হয়। এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ ইচ্ছারূপ সংকেতের দ্বারা নির্ধারিত হলেও সেই ইচ্ছা ঈশ্বরের নয়, মানুষের। এপ্রকার 'ডিত্থ' জাতীয় ব্যক্তিবাচক পদে অথবা আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের পারিভাষিক পদে যেমন **শুধু সংকেতই শক্তি**, তেমনি 'ঘট', 'পট' প্রভৃতি জাতিবাচক পদের ক্ষেত্রেও ঈশ্বর-সংকেতের পরিবর্তে **শুধু সংকেতকেই** শক্তিরূপে গ্রহণ করা সমীচীন।—এমন অভিমতই প্রকাশ করে অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'ডিত্থাদীনামিব...এব শক্তি', 'শক্তি'র স্বরূপ সম্পর্কে অন্নংভট্ট দীপিকাতে নব্যন্যায়মত পোষণ করেছেন। নব্যমতে, 'সংকেতই শক্তি—সেই সংকেত ঈশ্বরের হতে পারে, অন্য কোন চেতন পুরুষেরও—যথা মানুষেরও—হতে পারে।

তাহলে, অন্নংভট্টের মতে, শক্তি কোন অতিরিক্ত পদার্থ নয়, শক্তি হল ইচ্ছা বা সংকেত। শক্তিকে ঈশ্বর-সংকেত রূপে গণ্য না করে, অথবা অনন্ত মনুষ্যকৃত সংকেতরূপে গণ্য না করে কেবল সংকেতরূপেই গণ্য করা সমীচীন। তাহলে 'সংকেত'ই (ইচ্ছাই) 'শক্তি'। পদ ও পদার্থের সংকেতরূপ সম্বন্ধই শক্তি। **শক্তি অতিরিক্ত পদার্থ নয়।**

❑ ৭.৩. পদ-শক্তি দ্বারা কী বোধিত হয়—মাত্র জাতি, অথবা মাত্র ব্যক্তি, অথবা জাতিধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তি?

তর্কদীপিকা ঃ গবাদি-শব্দানাং জাতাবেব শক্তিঃ, বিশেষণতয়া জাতেঃ প্রথম-উপস্থিতত্বাৎ; ব্যক্তিলাভস্তু-আক্ষেপাদিতি কেচিৎ। তন্ন। গামানয়েত্যাদৌ বৃদ্ধ-ব্যবহারেণ সর্বত্র আনয়নাদেঃ ব্যক্ত্যাবেব সম্ভবেন জাতিবিশিষ্ট-ব্যক্তৌ এব শক্তি-কল্পনাৎ।

৭.৩. ব্যাখ্যা ঃ

শক্তি কাকে বোধিত করে—ব্যক্তি অথবা জাতি অথবা জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি?

দীপিকায় অন্নংভট্ট পদের 'শক্তি' সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন-পূর্বক তার মীমাংসা করেছেন। প্রশ্নটি হল,—'কোন পদের শক্তি যে অর্থ (পদার্থ) বোধিত করে তার স্বরূপ কী? সংকেতরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ শক্তি যাকে সরাসরি বোধিত করে তার স্বরূপ কী? 'গো', 'অশ্ব' 'ঘট'

'পট' ইত্যাদি শব্দ শ্রবণমাত্র কোন্ অর্থের (পদার্থের) বোধ হয়? সংকেতরূপ শক্তি **সরাসরি** যে অর্থকে বোধিত করে, তাকে বলে **'শক্যার্থ'** বা **'মুখ্যার্থ'**। 'ঘট', 'পট' ইত্যাদি শব্দের শক্যার্থ কী?—এসব শব্দ শ্রবণমাত্র শক্তি-দ্বারা প্রথমে কোন অর্থ স্মরিত বা বোধিত হয়? পদের শক্যার্থ অর্থাৎ **শক্তি দ্বারা বোদিত প্রথম ক্ষণের অর্থ কি মাত্র জাতি, অথবা মাত্র ব্যক্তি অথবা** জাতিধর্মবিশিষ্ট **ব্যক্তি?"**

উপরোক্ত প্রকার প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে ঐক্যমত নেই।

একমতে, পদের দ্বারা **ব্যক্তি বোধিত হয়।** যেমন, 'গো' পদটি সরাসরি গোব্যক্তিকেই বোঝায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি বলা হয়, 'গরুটি যাচ্ছে' বা 'গরুগুলি ঘাস খাচ্ছে', বা 'গরুটি শুক্লবর্ণের' তাহলে 'গো' পদের দ্বারা (গো) ব্যক্তিই বোধিত হয়।

দ্বিতীয় মতে, পদের দ্বারা ব্যক্তির পরিবর্তে **ব্যক্তির আকৃতি** বোধিত হয়। এমতে, 'গো' পদটি সরাসরি গরুর অবয়ব-সংস্থানকে, যথা-গলকম্বল যুক্ত চতুষ্পদ-ইত্যাদি আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণীকেই বোধিত করে, যেহেতু গরুর এপ্রকার অবয়ব-সংস্থানের জন্যই গরুকে অন্যান্য প্রাণী থেকে—ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি প্রাণী থেকে ভিন্নরূপে জানা যায়।

তৃতীয় মতে, পদের দ্বারা কেবল **জাতি বোধিত হয়।** যেমন, গোত্বের বা গোত্ব-জাতির ধারণা না থাকলে বিশেষ কোন ব্যক্তিকে 'গো'নামে চিহ্নিত করা যায় না। এজন্য 'গো' শব্দটি শোনামাত্র শ্রোতার মনে প্রথমে গোসমূহের অনুগতধর্ম বা জাতিধর্ম মানসপটে উদিত হয়।

চতুর্থ মতে, পদের দ্বারা **জাতি (আকৃতি)-বিশিষ্ট ব্যক্তি বোধিত হয়।** জাতিধর্ম যেমন ব্যক্তিকে আশ্রয় না করে থাকতে পারে না, তেমনি ব্যক্তিও জাতিধর্ম বিশিষ্টরূপেই অবস্থান করে। কাজেই 'গো' **শব্দটি গোত্বজাতিবিশিষ্ট** গোব্যক্তিকেই বোধিত করে।

উপরি-উক্ত চারটি মতের মধ্যে তৃতীয় মতটি ভাট্ট-মীমাংসকদের এবং চতুর্থ মতটি নৈয়ায়িকদের। নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট দীপিকাতে মীমাংসকমত খণ্ডন পূর্বক স্বমত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ভাট্ট-মীমাংসকমত—জাতিশক্তিবাদ

ভাট্ট-মীমাংসক মতে, একটি পদের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বোধিত হয় একটি শ্রেণীগতধর্ম বা জাতিধর্ম, ব্যক্তি বোধিত হলেও তা পরম্পরাভাবে বোধিত হয়। কাজেই, **পদের শক্যার্থ বা মুখ্যার্থ হল জাতি,** ব্যক্তি নয়। দীপিকাতে অন্নংভট্ট মীমাংসকদের এপ্রকার মতবাদের হেতু বা যুক্তিকে এভাবে উল্লেখ করেছেন, 'বিশেষণতয়া জাতেঃ প্রথম-উপস্থিতত্বাৎ ; ব্যক্তিলাভস্তু আক্ষেপাদিতি কেচিৎ', অর্থাৎ **'বিশেষণরূপে প্রথমে জাতি উপস্থিত হয় এবং আক্ষেপ বা অর্থাপত্তি দ্বারা ব্যক্তির বোধ জন্মায়।** বিশদার্থ হল—বিশেষণ পদার্থের জ্ঞান না হলে বিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞান হতে পারে না। এজন্য বিশিষ্টের জ্ঞানের পূর্বে বিশেষণের জ্ঞান হয়। 'গো' শব্দের অর্থবোধের সময় **প্রথমে** আমাদের মনে যা প্রতিভাত হয় তা হল, 'প্রত্যেক গো-ব্যক্তির (অর্থাৎ গরুর) মধ্যে অনুগত বা সাধারণভাবে উপস্থিত কোন সমান-ধর্ম বা গোত্বজাতি। গোত্ব-জাতির জ্ঞান হবার **পরক্ষণেই** আক্ষেপ বা অর্থাপত্তির দ্বারা গো-ব্যক্তির জ্ঞান হয়। জাতির **জ্ঞানটি হয় সাক্ষাৎভাবে, ব্যক্তির জ্ঞান হয়** পরম্পরাভাবে। সাক্ষাৎ জ্ঞানেই সংকেতরূপ শক্তি থাকে। জাতির জ্ঞান সাক্ষাৎ (কেননা প্রথমক্ষণের) হওয়ায় জাতিতেই শক্তি থাকে।

এখানে ভাট্ট-মীমাংসকের যুক্তি হল,—'যে পদার্থ অন্যের দ্বারা লভ্য নয়, সেই পদার্থেই শক্তি স্বীকার করতে হয়, আর যা অন্যের দ্বারা লভ্য, সেই পদার্থে শক্তি স্বীকার করা চলে না'। জাতির জ্ঞান অন্য-লভ্য নয়, তা সাক্ষাৎভাবে লভ্য। এজন্য জাতিতেই শক্তি। ব্যক্তির জ্ঞান অন্য লভ্য, অর্থাপত্তি প্রমাণ সাপেক্ষ হওয়ায় ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা চলে না।

ভাট্ট-মীমাংসকগণ তাঁদের জাতিশক্তিবাদের সমর্থনে অপর এক যুক্তি প্রদর্শন করেছেন—'লাঘবে'র যুক্তি। যুক্তিটি হল—জাতির পরিবর্তে ব্যক্তিতে, যথা—গো-ব্যক্তিতে গো-শব্দের শক্তি স্বীকার করলে একটির পরিবর্তে অনন্ত শক্তি স্বীকার করতে হয়। গো-ব্যক্তিসমূহ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিনকালে অবস্থান করার জন্য অসংখ্য হওয়ায়, তাদের প্রত্যেককে বোধিত করার ক্ষেত্রে 'গো'-শব্দটিকে অনন্ত শক্তিসম্পন্নরূপে স্বীকার করতে হয়। প্রত্যেক গো-ব্যক্তিতে, একটি একটি করে অনন্তশক্তি স্বীকার করলে 'গৌরব' (দোষ) হয়। পক্ষান্তরে, 'সংকেতরূপ শক্তি মাত্র জাতিকে বোধিত করে', এমন বললে 'লাঘব' (গুণ) হয়, কেননা ব্যক্তিসমূহ একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়—যেমন গোব্যক্তিসমূহ একটি গোত্ব-জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়—একটি মাত্র শক্তি দ্বারা পদের অর্থ বা পদার্থ বোধিত হতে পারে। গো-জাতিতে অর্থাৎ গোত্বে শক্তি স্বীকার করলে সকল গো-ব্যক্তিতে একটিমাত্র শক্তি স্বীকার করলে 'লাঘব' হয় বলে গোত্বজাতিতেই শক্তি স্বীকার করতে হয়।—এটাই হল মীমাংসক জাতিশক্তিবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

অন্নংভট্ট কর্তৃক মীমাংসক জাতিশক্তি মতবাদ খণ্ডন ও ন্যায়সম্মত জাতিবিশিষ্টব্যক্তি-শক্তি মতবাদ প্রতিষ্ঠা ঃ

অন্নংভট্ট দীপিকাতে মীমাংসকদের জাতিশক্তি মতবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে বলেন, 'তন্ন', অর্থাৎ 'এমন বলা সঙ্গত হয় না যে, জাতিতেই শক্তি'। ন্যায়সম্মত অভিমত সমর্থন করে অন্নংভট্ট বলেন, **কোন পদের দ্বারা যা বোধিত হয় তা মাত্র জাতি নয়, আবার মাত্র ব্যক্তি নয়, তা হল জাতি-বিশিষ্ট-ব্যক্তি**। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উভয় সম্প্রদায়ই একথা মানেন যে, কোন পদের শক্তির দ্বারা মাত্র ব্যক্তি বোধিত হয় না। পার্থক্য হল, মীমাংসক মতে যা বোধিত হয় তা মাত্র জাতি, আর ন্যায়মতে যা বোধিত হয় তা জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি।

'বিশেষণতয়া জাতেঃ প্রথম-উপস্থিতত্বাৎ'—'**বিশেষণরূপে জাতির জ্ঞানই প্রথমে মানসপটে উপস্থিত হয়**' (এবং যা অ-অন্যলভ্যরূপে প্রথমে উপস্থিত হয়, সেই পদার্থেই শক্তি স্বীকার করতে হয়)—জাতিশক্তিবাদের সমর্থনে মীমাংসকদের এই মূল কথাটিকেই অন্নংভট্ট যুক্তিহীন বলেন। নৈয়ায়িক অন্নংভট্টের মতে, **বিশেষণরূপে জাতির জ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞানের পূর্বে কখনই সম্ভব নয়**। গোত্ববিশেষণরূপে গোত্ব জাতির জ্ঞান কখনই গো-ব্যক্তির পূর্বে সম্ভব নয়। ব্যক্তি যেমন জাতি রহিতরূপে থাকে না, জাতিও তেমনি ব্যক্তিকে আশ্রয় করে থাকে। জাতিধর্ম হল, অনেক ব্যক্তির মধ্যে অনুগত সমানধর্ম। গোত্বরূপ জাতিধর্মটি হল, অনেক গো-এর (গরুর) মধ্যে সাধারণভাবে উপস্থিত ধর্ম। কাজেই, 'অনেক ব্যক্তির' ভান না হলে 'অনেকের মধ্যে অনুগত সমানধর্ম বা জাতির' ভানও হতে পারে না। **কাজেই, কোন পদের শক্তি যা বোধিত করে, তা যেমন মাত্র ব্যক্তি নয়, তেমনি মাত্র জাতিও নয়। তা হল** জাতিবিশিষ্টব্যক্তি।

আত্মপক্ষ সমর্থনে নৈয়ায়িকগণ বলেন, জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করলে অনন্তশক্তি স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না, এবং ফলত 'গৌরব' (দোষ) হয় না। তাৎপর্য হল—ন্যায়মতে জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি, এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, তাদের মধ্যে অবিনাভাবসম্বন্ধ (একটি অন্যটি ছেড়ে থাকতে পারে না, এমন সম্বন্ধ) থাকায় তারা একত্রে একটি পদার্থ—**জাতিবিশিষ্টব্যক্তি** ; এবং পদার্থ একটি হওয়ায় অনন্ত শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন হয় না, একটিমাত্র শক্তি স্বীকার করলেই চলে। মহর্ষি গৌতমও বলেছেন, 'ব্যক্তি-আকৃতি-জাতয়স্তু পদার্থ' অর্থাৎ ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি মিলে একটি পদার্থ এবং সেজন্য তারা একটি শক্তি দ্বারা উপস্থিত হয়।' তবে, নৈয়ায়িক বলেন, কোন পদের শক্তির দ্বারা জাতিবিশিষ্টব্যক্তি বোধিত হলেও, ক্ষেত্রবিশেষে কখনো জাতি (মাত্র জাতি নয়), কখনো ব্যক্তি (মাত্র ব্যক্তি নয়) আবার কখনো আকৃতি (মাত্র আকৃতি নয়) **প্রাধান্য পায়**। যেমন, 'গৌঃ পদা ন স্পর্ষ্টব্যা'—'গরুকে পায়ের দ্বারা স্পর্শ করবে না', এই বাক্যে 'গো' শব্দের দ্বারা সমস্ত গরুতে পাদস্পর্শ নিষিদ্ধ হয়েছে। এখানে জাতি প্রধান, ব্যক্তি অপ্রধান। 'গাং মুঞ্চ'—'গরুর বাঁধন খুলে দাও', এই বাক্যে 'গো' শব্দের দ্বারা একটি বিশেষ গরুর অর্থাৎ গো-ব্যক্তির বন্ধন উন্মোচন উক্ত হয়েছে। এখানে ব্যক্তি প্রধান, জাতি অপ্রধান। 'পিষ্টকময্য গাবঃ ক্রিয়ন্তাম্'—'তণ্ডুলচূর্ণের (চালেরচূর্ণ) পিণ্ডের দ্বারা গো নির্মাণ করতে হবে', অর্থাৎ 'চালের গুঁড়ো দিয়ে গো-আকৃতি-বিশিষ্ট পশু নির্মাণ করতে হবে',—এই বাক্যে গো-ব্যক্তির আকৃতি প্রধান, জাতি অপ্রধান। তবে, এক্ষেত্রেও জাতির ধারণা উপস্থিত থাকে, যেহেতু গোত্বজাতির ধারণা ব্যতীত গো-আকৃতিবিশিষ্ট পশু নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। স্পষ্টতই, এসবের প্রতি ক্ষেত্রে শক্তি দ্বারা যা বোধিত হয় তা মাত্র জাতি অথবা মাত্র আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি বোধিত হয় না, একমাত্র বোধিত বিষয় হল জাতিবিশিষ্টব্যক্তি।

অন্নংভট্ট মীমাংসক জাতিশক্তি মতবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে এবং **জাতিবিশিষ্টব্যক্তি-শক্তি মতবাদ** প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে অবশেষে 'গাম্ আনয়' ইত্যাদি স্থলে '**বৃদ্ধব্যবহারের**' (অভিজ্ঞজনের আচরণের) উল্লেখ করেছেন।' বিশদার্থ হল—'গাম্ আনয়'—'গরুটিকে আন' এই বাক্য শ্রবণ করে কোন অভিজ্ঞব্যক্তি রজ্জু বন্ধনের দ্বারা গোত্বজাতিকে আনয়ন করতে প্রবৃত্ত হয় না, কেননা জাতিকে ঐভাবে বন্ধন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বাক্যটি অর্থহীন নয়, অর্থপূর্ণ, কেননা বাক্যটি শুনে অভিজ্ঞব্যক্তি আনয়ন-ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়। 'গাম্ আনয়' এই বাক্যটি শুনে বৃদ্ধ বা অভিজ্ঞব্যক্তি যাকে আনয়ন করে তা হল গোত্বজাতিবিশিষ্ট একটি বিশেষ গরু। তেমনি 'গৌর্নষ্টা'—'গরুটি মৃত', 'গৌর্জাতা'—'গরুটির জন্ম হল', ইত্যাদি প্রকারে বাক্য শুনে কোন অভিজ্ঞব্যক্তি এমন মনে করেন না যে, 'গোজাতির মৃত্যু হল', 'গোজাতির জন্ম হল'। জাতির জন্ম ও মৃত্যু সম্ভব নয়। এসবের প্রতি ক্ষেত্রে গো শব্দ যা বোধিত করে তা হল গোত্ববিশিষ্ট বিশেষ গরু, যাকে আনা যায়, যার মৃত্যু ও জন্ম সম্ভব হয়। কাজেই মীমাংসক মত অনুসরণ করে এমন বলা চলে না যে, জাতিতেই শক্তি ; বৃদ্ধগণের (অভিজ্ঞব্যক্তির) ব্যবহারের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জাতিবিশিষ্ট- ব্যক্তিতেই শক্তি। এভাবে দীপিকাতে '**বৃদ্ধব্যবহারে**'র উল্লেখ করে অন্নংভট্ট মীমাংসক মত খণ্ডন করেন এবং ন্যায়সম্মত মত প্রতিষ্ঠা করেন।

❑ ৭.৪. একটি পদের শক্তি কীভাবে নির্ধারিত হয় ঃ শক্তি-গ্রহের উপায় কী?

তর্কদীপিকা ঃ শক্তিগ্রহশ্চ বৃদ্ধব্যবহারেণ। তথাহি ব্যুৎপিৎসুর্বালো 'গামানয়' ইতি উত্তমবৃদ্ধ-বাক্য শ্রবণানন্তরং মধ্যমবৃদ্ধস্য প্রবৃত্তিমুপলভ্য গবানয়নং চ দৃষ্ট্বা মধ্যমবৃদ্ধ-প্রবৃত্তি-জনক-জ্ঞানস্য অন্বয়-ব্যতিরেকভ্যাং বাক্যজন্যত্বং নিশ্চিত্য 'অশ্বমানয়', 'গাং বধান' ইতি বাক্যান্তরে আবাপ-উদ্বাপাভ্যাং গোপদস্য গোত্ব-বিশিষ্টে শক্তিঃ, অশ্বপদস্য অশ্বত্ববিশিষ্টে শক্তিঃ ইতি ব্যুৎপদ্যতে।

ননু সর্বত্র কার্যপরত্বাদ্ ব্যবহারস্য কার্য-বাক্যে এব ব্যুৎপত্তিঃ, ন সিদ্ধে ইতি চেৎ। ন। 'কাশ্যাং ত্রিভুবনতিলকো ভূপতিঃ' ইত্যাদৌ সিদ্ধেঽপি ব্যবহারাৎ। 'বিকশিত-পদ্মে মধুনি পিবতি মধুকরঃ' ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধ-পদ-সমভিব্যাহারাৎ সিদ্ধেঽপি মধুকরাদি-ব্যুৎপত্তিদর্শনাচ্চ।

৭.৪. ব্যাখ্যা ঃ কোন পদের শক্তি কোন্ পদার্থকে বোধিত করে তা সর্বপ্রথমে কীভাবে জানা যায়? 'শক্তিগ্রহ' অর্থাৎ কোন পদের শক্তি কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হয়, তা প্রথমে কীভাবে নির্ধারিত হয়? **কোন ব্যক্তি পদ ও পদার্থের সম্বন্ধকে অর্থাৎ সংকেতরূপ শক্তিকে প্রথমে কীভাবে জানতে পারে?** এজাতীয় প্রশ্নের উত্তরে অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'শক্তিগ্রহশ্চ বৃদ্ধব্যবহারেণ'—**'বৃদ্ধগণের ব্যবহারের দ্বারা পদ ও পদার্থের শক্তিরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান হয়।'** প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত অনুসারে, পদ ও পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞান—কোন্ পদ কোন্ পদার্থকে বোধিত করে, এমন জ্ঞান—আটটি উপায়ের দ্বারা সম্ভব হতে পারে। আটটি উপায় হল—ব্যাকরণ, উপমান, অভিধান, আপ্ত বাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবরণ এবং সিদ্ধপদের সান্নিধ্য। শাস্ত্রমতে, এই আটটি উপায়ের যে কোন একটি উপায়ের দ্বারা শক্তি-জ্ঞান হয় অর্থাৎ পদ ও পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞান উৎপন্ন হয়। **এই আটটি উপায়ের মধ্যে অন্নংভট্ট কেবল 'ব্যবহারে'র উল্লেখ করেছেন।** এর কারণ সম্ভবত এই যে, শক্তি-জ্ঞানের বা পদ-পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞানের জন্য আটটি উপায়ের মধ্যে **ব্যবহারই প্রধান ও প্রাথমিক উপায়** ; অন্যান্য উপায়গুলি অপেক্ষাকৃত বুৎপন্ন ব্যক্তিদের জন্য—সবেমাত্র শব্দার্থ-শিক্ষার্থী শিশু, বালক ইত্যাদিদের জন্য নয়। এজন্যই অন্নংভট্ট 'ব্যবহারে'র উল্লেখ করে বলেছেন, **'বৃদ্ধগণের অর্থাৎ অভিজ্ঞব্যক্তিদের ক্রিয়ামূলক ব্যবহারের দ্বারা পদ ও পদার্থের সম্বন্ধের জ্ঞান অর্থাৎ শক্তিগ্রহ হয়'**—'শক্তিগ্রহশ্চ বৃদ্ধব্যবহারেণ'। পদ ও পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞান **(শক্তিগ্রহ)** কীভাবে হয়, দীপিকাতে অন্নংভট্ট তার ব্যাখ্যা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্নংভট্ট প্রদত্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল—

কোন বুৎপিৎসু অর্থাৎ বাক্যার্থ জানতে ইচ্ছুক বালকের কাছে উত্তমবৃদ্ধ মধ্যমবৃদ্ধকে বলেন, 'গাম্ আনয়'—'গরুটিকে নিয়ে এসো'। **এখানে 'বৃদ্ধ' শব্দের অর্থ 'শব্দার্থ জানেন এমন অভিজ্ঞব্যক্তি'**। এখানে 'উত্তম' ও 'মধ্যম' শব্দের দ্বারা জ্ঞানের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্দেশিত হয়নি, 'বক্তা' ও 'শ্রোতা' নির্দেশিত হয়েছে। যিনি বাক্যের মাধ্যমে আদেশ করেন তিনি 'উত্তম', আর যিনি ঐ বাক্য শ্রবণপূর্বক সেই আদেশ পালন করেন তিনি 'মধ্যম'। এবার ধরা যাক, উত্তমবৃদ্ধের 'গাম আনয়' বাক্যটি শ্রবণ করে মধ্যমবৃদ্ধ গাম আনয়নে প্রবৃত্ত হন এবং গলকম্বল বিশিষ্ট এক চতুষ্পদীপশুকে আনয়ন করেন। পার্শ্বস্থিত অনুসন্ধিৎসু বালকটি উত্তমবৃদ্ধের বাক্য শ্রবণপূর্বক এবং মধ্যমবৃদ্ধের কর্ম (গো আনয়নরূপ কর্ম) প্রত্যক্ষপূর্বক উপলব্ধি করে যে, গাম আনয়ন ক্রিয়াটি (ব্যবহারটি), মধ্যমবৃদ্ধের প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়াটি, অবশ্যই উত্তমবৃদ্ধের

বাক্যের—'গাম্ আনয়' এই বাক্যের অর্থ-জন্য ; কেননা বাক্যটি শ্রবণ মাত্রই সে গরুটি আনয়ন করে, শ্রবণ করার পূর্বে আনে না। এখানে শ্রবণের পর আনয়নরূপ অন্বয়, এবং শ্রবণ ব্যতিরেকে না-আনয়নরূপ ব্যতিরেক—এই উভয় প্রকার সহচার থেকে বালকটির এমন নিশ্চিত বোধ উৎপন্ন হয় যে, 'গাম্ আনয়' উত্তমবৃদ্ধের এই বাক্যের অর্থবোধ হওয়ার জন্যই, সেই অর্থ অনুসারে মধ্যমবৃদ্ধ একটি গরুকে (গলকম্বল বিশিষ্ট চতুষ্পদ পশুকে) আনয়ন করে। কিন্তু বাক্যটির মধ্যে দুটি ভিন্ন শব্দ—'গাম্' এবং 'আনয়'—থাকায় বালকটি এই পর্যায়ে এটা নির্ধারণ করতে, পারে না—কোন্ শব্দটির অর্থ 'গরু' এবং কোন্ শব্দটির অর্থ 'আনয়নরূপ ক্রিয়া', কোন পদটি গলকম্বলবিশিষ্ট পশুকে বোঝায়, আর কোন পদটি আনয়ন-ক্রিয়াকে বোঝায়?

এবার ধরা যাক, ঐ একই পরিস্থিতিতে অবস্থান করে উত্তমবৃদ্ধ মধ্যম-বৃদ্ধকে বলেন, 'গাং বধান, অশ্বম্ আনয়'—'গরুটিকে বন্ধন কর, ঘোড়াটিকে নিয়ে এসো'। পার্শ্বস্থিত বালকটি এক্ষেত্রেও লক্ষ্য করে যে, উত্তমবৃদ্ধের ঐ বাক্য অনুসারে মধ্যমবৃদ্ধ গরুটিকে বন্ধন করেন এবং ঘোড়াটিকে আনয়ন করেন। এমন অবস্থায়, **আবাপ-উদ্‌বাপের** দ্বারা বালকটি জানতে পারে যে, 'গো' পদের দ্বারা গোত্বজাতিবিশিষ্ট গরুকে বোঝায়, এবং 'অশ্ব' পদের দ্বারা অশ্বত্বজাতিবিশিষ্ট ঘোড়াকে বোঝায়। 'আবাপ' শব্দের অর্থ হল, 'সংগ্রহ করা', এবং 'উদ্‌বাপ' শব্দের অর্থ হল, 'বর্জন করা'। 'গাং বধান' এই বাক্যটি শুনে মধ্যমবৃদ্ধ এখানে গরুটিকে **বন্ধন করেন, যেখানে পূর্ববর্তী** 'গাম্ আনয়' বাক্যটি শুনে মধ্যমবৃদ্ধ গরুটিকে **আনয়ন** করেন। এখানে পূর্ববর্তী 'গাম্ আনয়' এবং পরবর্তী 'গাং বধান' এই দুটি বাক্যে সাধারণভাবে উপস্থিত শব্দ হল 'গাম' এবং সাধারণভাবে উপস্থিত পদার্থ হল 'গরু'। এখানে 'আনয়' এবং 'বধান' এদুটি শব্দের কোনটিও দুটি বাক্যে সাধারণভাবে উপস্থিত নয়। কাজেই উদ্‌বাপের দ্বারা 'আনয়' ও 'বধান' শব্দ দুটিকে বর্জন করে এবং আবাপের দ্বারা সাধারণভাবে উপস্থিত 'গাম' শব্দটি গ্রহণ করে বালকটি বুঝতে পারে যে, 'গাম' শব্দের অর্থ হল 'গোত্ববিশিষ্ট গোব্যক্তি'।

তেমনি আবার, পরবর্তী বাক্য 'অশ্বম্ আনয়' এবং পূর্ববর্তী বাক্য 'গাম্ আনয়', এই দুটি বাক্যে সাধারণভাবে উপস্থিত শব্দ হল 'আনয়' এবং সাধারণভাবে উপস্থিত ক্রিয়া হল 'আনয়ন'। এখানে 'অশ্ব' এবং 'গাম্' এদুটি শব্দের কোনটিও দুটি বাক্যে সাধারণভাবে উপস্থিত নয়। কাজেই, উদ্‌বাপের দ্বারা 'অশ্ব' ও 'গাম' এদুটি শব্দকে বর্জন করে এবং আবাপের দ্বারা সাধারণভাবে উপস্থিত 'আনয়' শব্দটি গ্রহণ করে বালকটি বুঝতে পারে যে, 'আনয়' শব্দের অর্থ হল, 'আনয়নরূপ ক্রিয়া'।

এভাবেই, অন্নংভট্টের মতে, বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারা শব্দার্থ-শিক্ষার্থীগণের কাছে, প্রাথমিক পর্যায়ে, পদের শক্তি—পদ ও পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞান নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ তারা জানতে পারে যে, কোন্ পদ কোন্ অর্থকে বোধিত করে। এভাবেই ব্যবহারের (ক্রিয়া বা কর্মের) দ্বারা শক্তিগ্রহ বা সংকেতরূপ শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

সিদ্ধবাক্যের অর্থ কি ব্যবহার-নির্ভর—ব্যবহারই কি শক্তিগ্রহের একমাত্র উপায়?

অনেকে মনে করেন, ব্যবহার অর্থাৎ প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়ার মাধ্যমেই শক্তিগ্রহ হয়। যেসব **'কার্য-বাক্য'** শ্রবণের পর শ্রোতার কোনরূপ প্রবৃত্তি হয়, কেবল সেইসব বাক্যেরই শ্রোতার

শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। কেবল ব্যবহারের দ্বারাই শক্তিগ্রহ বা প্রদত্ত পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞান হয় বলেই, 'গাম্ আনয়', 'অশ্বম্ বধান' ইত্যাদি কার্য-বাক্য শ্রবণ করে কোন ব্যক্তি গো-এর 'আনয়ন', অশ্বের 'বন্ধন' ইত্যাদি করলে, সেখানে উপস্থিত কোন শিক্ষার্থী বালক বুঝতে পারে যে, 'গো' পদের শক্তি গো-পদার্থে, 'অশ্ব' শব্দের শক্তি অশ্ব-পদার্থে। **ব্যাকরণ, উপমান, অভিধান, আপ্তবাক্য প্রভৃতি প্রবৃত্তিমূলক না হওয়ায়, সে-সব শক্তিগ্রাহকরূপে গ্রাহ্য হতে পারে না। এমতে, সিদ্ধবাক্য বা সিদ্ধপদ শক্তিগ্রাহক নয়। সে-সব বাক্য শ্রবণের পর শ্রোতার মধ্যে কোন আচরণ প্রকাশ পায় না, সেইসব বাক্য হল সিদ্ধবাক্য। তেমনি, যেসব পদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ থাকে না, সেইসব পদ হল সিদ্ধপদ। সিদ্ধপদ শ্রবণের পর কোন শাব্দবোধ হতে পারে না, যেহেতু তা কার্যত্ববোধক নয়। প্রাচীন প্রাভাকর মীমাংসকগণ এমন অভিমত পোষণ করেন।**

অন্নংভট্ট দীপিকাতে উপরি-উক্ত প্রাভাকর মীমাংসকদের মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলেন, 'ন'—'না' অর্থাৎ প্রাভাকর মতবাদটিকে গ্রহণযোগ্য বলা চলে না, যেহেতু মতবাদটি আমাদের অভিজ্ঞতা-বিরোধী। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ক্রিয়া-বিরহিতভাবেই অনেক পদের অর্থ আমরা বুঝতে পারি। সিদ্ধবাক্য বা সিদ্ধপদ (কার্যত্ববোধক নয় এমন বাক্য বা পদ) থেকেও শক্তির জ্ঞান (শক্তিগ্রহ) হয়। অন্নংভট্ট দীপিকাতে এমন দুটি বাক্যের উল্লেখ করেছেন যা ক্রিয়াশূন্য সিদ্ধপদ সমন্বিত সিদ্ধবাক্য, যদিও দুটি বাক্যই অর্থবহ। বাক্যদুটি হল, 'কাঞ্চ্যাং ত্রিভুবনতিলকো ভূপতিঃ' এবং 'বিকশিতপদ্মে মধুনি পিবতি মধুকরঃ'—'কাঞ্চীনগরীতে ত্রিভুবনতিলক ভূপতি ছিলেন বা আছেন', 'বিকশিত পদ্মে মধুকর মধু পান করে'। প্রথম বাক্যটি (কাঞ্চীনগরীতে ত্রিভুবনতিলক ভূপতি ছিলেন বা আছেন) আমাদের কোন ক্রিয়া-কর্মাদিতে প্রবৃত্ত না করলেও বাক্যটির অর্থ আমাদের বোধগম্য হয়। বাক্যটি কার্য-বাক্য না হয়ে সিদ্ধবাক্য হওয়া সত্ত্বেও তা আমাদের কাছে বোধগম্য। দ্বিতীয় বাক্যটিও—'বিকশিত পদ্মে মধুকর মধু পান করে' বাক্যটিও কার্য-বাক্য নয়, সিদ্ধবাক্য এবং বাক্যের অন্তর্গত 'মধুকর' শব্দটিও একটি সিদ্ধপদ, যেহেতু তা কার্যত্ববোধক নয়। যে ব্যক্তির কাছে 'বিকশিত পদ্ম', 'মধু', 'পান করা' প্রসিদ্ধ পদ হয়, অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত পদ হয়, তার কাছে ঐসব পদের সান্নিধ্যবশত 'মধুকর' সিদ্ধপদটির অর্থও বোধগম্য হয়। **স্পষ্টতই, সিদ্ধবাক্য অথবা সিদ্ধপদ থেকেও শক্তিগ্রহ হয়ে থাকে। কাজেই, অন্নংভট্টের সিদ্ধান্ত হল—'কেবল কার্য-বাক্যই শক্তিগ্রাহক'—প্রাভাকর মীমাংসকদের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।** বাস্তবিকপক্ষে, অন্নংভট্টের অভিমত অনুসরণ করে এমন বলাই সঙ্গত হয় যে, কোন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সিদ্ধবাক্য বা সিদ্ধপদ শ্রবণের পরেও আমাদের শাব্দবোধ হয়ে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে, আমাদের জীবনে অধিকাংশ অর্থবোধক বাক্যই হল সিদ্ধবাক্য, যেসব বাক্য শ্রবণের পর শ্রোতার মধ্যে কোন আচরণ প্রকাশ পায় না।

❑ ৭.৫. লক্ষণা ও তার প্রকারভেদ

তর্কদীপিকা : লক্ষণাপি শব্দবৃত্তিঃ। শক্য-সম্বন্ধো লক্ষণা। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যত্র গঙ্গাপদবাচ্য-প্রবাহ-সম্বন্ধাৎ এব তীরোপস্থিতৌ তীরেঽপি শক্তির্ন কল্প্যতে। সৈন্ধবাদৌ লবণ-অশ্বয়োঃ পরস্পর-সম্বন্ধাভাবাৎ নানাশক্তি-কল্পনম্।

লক্ষণা ত্রিবিধা—জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা, জহদজহল্লক্ষণা চেতি। যত্র বাচ্যার্থস্য অন্বয়াভাবঃ, তত্র জহল্লক্ষণা। যথা—মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি। যত্র বাচ্যার্থস্য অপি অন্বয়ঃ, তত্র অজহদিতি। যথা ছত্রিণো গচ্ছন্তি। যত্র বাচ্যৈক-দেশ-ত্যাগেন একদেশান্বয়ঃ, তত্র জহদজহদিতি। যথা তত্ত্বমসি ইতি।

৭.৫. ব্যাখ্যা ঃ (ক) লক্ষণা

লক্ষণা কী?

পদ ও পদার্থের (পদের অর্থের) সম্বন্ধকে 'বৃত্তি' বলা হয়। পদ ও পদার্থের সম্বন্ধরূপ বৃত্তি দুই প্রকার—**শক্তি** ও **লক্ষণা**। তাহলে **সংকেতরূপ শক্তির মতো লক্ষণাও পদের একপ্রকার বৃত্তি**। এজন্য অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'লক্ষণাপি শব্দবৃত্তিঃ'—'শক্তি'র মতো 'লক্ষণা'ও পদের একপ্রকার বৃত্তি। 'শক্তি' হল পদের সঙ্গে অর্থের (অর্থাৎ পদার্থের) এক প্রকার সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধের দ্বারা একটি পদ কেবল মাত্র ঐ পদের অর্থকে জ্ঞাপন করে অথবা একটি অর্থের স্মারক হয়। এজন্য 'শক্তি' প্রসঙ্গে দীপিকাতে বলা হয়েছে, 'অর্থ-স্মৃতি-অনুকূল-পদার্থ-সম্বন্ধঃ শক্তিঃ'। শক্তির দ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয় অথবা স্মরণ হয়, সেই অর্থকে বলে শক্য' বা **শক্যার্থ'** (বা মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ)। **শক্যের সম্বন্ধই হল লক্ষণা।** অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'শক্য-সম্বন্ধো লক্ষণা'। শক্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অর্থকেই বলা হয় **'লক্ষণা' বা 'লক্ষ্যার্থ'।**

শক্তি ও লক্ষণার মধ্যে পার্থক্য

পদের বৃত্তিরূপে শক্তির মতো লক্ষণার দ্বারাও একটি শব্দের (পদের) অর্থ বোধিত হলেও সেই দুটি অর্থের মধ্যে—শক্তির দ্বারা বোধিত শক্যার্থ এবং লক্ষণার দ্বারা বোধিত লক্ষ্যার্থের মধ্যে পার্থক্য আছে। সংকেতরূপ শক্তি শব্দের অর্থকে, শক্যার্থকে, **সাক্ষাৎভাবে** বোধিত করে, আর লক্ষণা শব্দের অর্থকে, লক্ষ্যার্থকে, অসাক্ষাৎভাবে, **পরম্পরাভাবে** বোধিত করে। শক্তি কোন **মাধ্যম ব্যতীত** সরাসরি বা সাক্ষাৎভাবে শব্দের অর্থ জ্ঞাপন করে। এজন্যই শক্যার্থকে বলা হয় **'মুখ্যার্থ'**, আর লক্ষ্যার্থকে বলা হয় **'গৌণার্থ'। শব্দের গৌণ অর্থ মুখ্য অর্থের ওপর নির্ভর করে।** একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে অন্নংভট্ট শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের মধ্যে—সাক্ষাৎ অর্থ ও অসাক্ষাৎ অর্থের মধ্যে—পার্থক্যকে বুঝিয়েছেন—

দৃষ্টান্তটি হল 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—'ঘোষপল্লী গঙ্গায় অবস্থিত'। বাক্যটির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করলে তা অর্থপূর্ণ হতে পারে না, অর্থহীন হয়। বাক্যটির যথাশ্রুত অর্থ হল, 'ঘোষপল্লী গঙ্গা নামক জলপ্রবাহে অবস্থিত'। বস্তুত, জলপ্রবাহে কোন পল্লী অবস্থান করতে পারে না, কোন মানুষ বসবাস করতে পারে না। কিন্তু বাক্যটি আমাদের কাছে অর্থহীন নয় এবং প্রায়শই আমরা এমন কথা বলে থাকি। 'গোপপল্লী কোথায় আছে'? এমন জিজ্ঞাসার উত্তরে আমরা এমন বলে থাকি, 'গোপপল্লী গঙ্গার ওপরে অবস্থিত'। আসলে এখানে 'গঙ্গা' শব্দটির শক্যার্থ গ্রহণ করা হয় না, লক্ষ্যার্থ বা লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করা হয়। 'গঙ্গা' শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ বা শক্যার্থ হল 'জলপ্রবাহ', আর লক্ষ্যার্থ হল ঐ প্রবাহের সঙ্গে **সামীপ্য-সম্বন্ধে** যুক্ত 'তটভূমি' বা 'তীর'। 'গঙ্গায়াং ঘোষ', এই বাক্যে 'গঙ্গা' শব্দের শাক্যার্থ 'জলপ্রবাহ'কে গ্রহণ করলে বাক্যটি অর্থহীন হয়, কেননা ঘোষপল্লী গঙ্গারূপ জলপ্রবাহে অবস্থান করতে পারে না। বাক্যটিকে অর্থপূর্ণরূপে গণ্য করতে হলে 'গঙ্গা' শব্দের দ্বারা শক্যার্থের পরিবর্তে লক্ষ্যার্থকে গ্রহণ করতে হবে এবং

সেক্ষেত্রে বাক্যটির অর্থ হবে, 'ঘোষপল্লী গঙ্গার তীরে অবস্থিত', যা নিঃসন্দেহে অর্থপূর্ণ। এই লাক্ষণিক অর্থটি এখানে **শক্যার্থ-সম্বন্ধী**, কেননা 'গঙ্গা' শব্দের শক্যার্থ হল 'জলপ্রবাহ', আর ঐ জলপ্রবাহের **সামীপ্য-সম্বন্ধী** হল তটভূমি বা তীর। 'গঙ্গা' শব্দের সঙ্গে জলপ্রবাহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, আর তীরের সঙ্গে পরম্পরা সম্বন্ধ—জলপ্রবাহের সঙ্গে সংযোগবশত সম্বন্ধ। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই বাক্যে 'গঙ্গা' শব্দের পরম্পরা অর্থ বা লক্ষ্যার্থই গ্রহণ করা হয়েছে। পরম্পরা সম্বন্ধটি এ প্রকার ঃ গঙ্গা—জলপ্রবাহ—তীর।

নানাশক্তি প্রসঙ্গ ঃ

এখানে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন হল,—**নানাশক্তির উল্লেখ করে, এখানে 'গঙ্গা' শব্দের 'দুটি শক্তি'র উল্লেখ করে, কেন এমন বলা যাবে না যে, 'গঙ্গা' শব্দের একটি শক্তি 'জলপ্রবাহ'কে এবং অন্য শক্তিটি 'তটভূমি' বা 'তীর'কে বোধিত করে? অর্থাৎ একটিকে 'শক্যার্থ' এবং অন্যটিকে 'লক্ষ্যার্থ'রূপে গণ্য না করে দুটি অর্থকেই 'শক্যার্থ' বলা যাবে না কেন?** প্রশ্নোত্তরে অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'যেখানে দুটি অর্থের মধ্যে **পরম্পরা সম্বন্ধের অভাব থাকে**, অর্থাৎ যেখানে **দুটি অর্থ নিঃসম্পর্কিত**, সেখানে একটি অর্থকে শক্যার্থ ও অন্যটিকে লক্ষ্যার্থরূপে গণ্য না করে, দুটি শক্তি (নানা শক্তি) স্বীকারপূর্বক দুটি অর্থকেই 'শক্যার্থরূপে গণ্য করতে হয়' (পরম্পর-সম্বন্ধাভাবাৎ নানাশক্তি-কল্পনম্')। নানাশক্তির দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট 'সৈন্ধব' শব্দটির উল্লেখ করেছেন। ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'সৈন্ধব' শব্দটির অর্থ হল 'সিন্ধু নামক দেশের কোন বিষয়বস্তু'। কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে শব্দটি দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থ হল 'লবণ' (সৈন্ধব লবণ), অন্য অর্থটি হল 'এক প্রকার অশ্ব'—'সিন্ধুদেশীয় ঘোড়া'। এখানে 'সৈন্ধব' শব্দের দ্বারা বোধিত দুটি অর্থই নিঃসম্পর্কিত, পরম্পরা-সম্বন্ধরহিত, অর্থাৎ এমন নয় যে একটি অর্থ অন্য অর্থটির সঙ্গে কোন না কোনভাবে সম্পর্কিত। এখানে পরিস্থিতি বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় যদি কেউ বলে, 'সৈন্ধব আনয়ন কর' তাহলে 'সৈন্ধব' শব্দটির অর্থ হয় 'লবণ' ; আর অশ্বারোহীর পোষাক পরিধান করে কেউ যদি বলে 'সৈন্ধব আনয়ন কর', তাহলে 'সৈন্ধব' শব্দটির অর্থ হয় 'ঘোড়া'। স্পষ্টতই, এখানে একটি অর্থকে শক্যার্থ (মুখ্যার্থ) এবং অন্য অর্থটিকে পরম্পরা অর্থ বা লক্ষ্যার্থ (গৌণার্থ) বলা যাবে না। অন্নংভট্টের অভিমত অনুসারে, যেহেতু এখানে দুটি অর্থই (পরিস্থিতি অনুসারে) সাক্ষাৎভাবে বোধিত হয়, দুটি অর্থকেই শক্যার্থরূপে গণ্য করতে হবে এবং শব্দটির ('সৈন্ধব' শব্দটির) নানাশক্তি কল্পনা করতে হবে।

কিন্তু 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ', এই বাক্যে 'গঙ্গা' শব্দটি 'সৈন্ধব' শব্দটির মতো নয়। 'সৈন্ধব' শব্দটির মতো 'গঙ্গা' শব্দে নানাশক্তি স্বীকার করা সঙ্গত হবে না, কেননা এখানে দুটি অর্থ—'জলপ্রবাহ' এবং 'তীর', এ-দুটি অর্থ, নিঃসম্পর্কীত নয় ; গঙ্গারূপ জলপ্রবাহ এবং তটভূমির মধ্যে **নৈকট্য-সম্পর্ক** আছে। এখানে 'গঙ্গা' শব্দ উচ্চারিত হলে প্রথমে যে চিত্র মনোমধ্যে উদ্ভাসিত হয় তা হল 'জলপ্রবাহ', পরে সেই প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত 'তটভূমির' চিত্র উদিত হয়। প্রথমটি অর্থাৎ 'জলপ্রবাহ' সাক্ষাৎভাবে বোধিত এবং তজ্জন্য শক্যার্থ, আর ঐ সাক্ষাৎ অর্থের সঙ্গে সামীপ্য সম্বন্ধে যুক্ত 'তটভূমি' বা 'তীর' হল শব্দটির পরম্পরা অর্থ বা লক্ষ্যার্থ (বা লক্ষণার্থ)। 'গঙ্গা' শব্দে একটিমাত্র শক্তি স্বীকার করে যদি দুটি অর্থই ব্যাখ্যা করা

সম্ভব হয়, তাহলে নানাশক্তি স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। এজাতীয় ক্ষেত্রে নানাশক্তি স্বীকার করলে গৌরব (দোষ) হয়, উপরন্তু লক্ষণাবৃত্তিরও উচ্ছেদ হয়। লক্ষণাবৃত্তি-উচ্ছেদ সমীচীন হতে পারে না, কেননা লাক্ষণিক অর্থ (বা লক্ষ্যার্থ) সর্বসম্মত।

(খ) লক্ষণার প্রকারভেদ

অন্নংভট্ট দীপিকাতে তিন প্রকার লক্ষণার উল্লেখ করেছেন। যথা—(১) জহৎলক্ষণা, (২) অজহৎলক্ষণা ও (৩) জহৎ-অজহৎ-লক্ষণা। জহৎ-লক্ষণাকে 'জহৎস্বার্থা লক্ষণা', অজহৎলক্ষণাকে 'অজহৎস্বার্থালক্ষণা' ও জহৎ-অজহৎ-লক্ষণাকে 'জহৎ-অজহৎস্বার্থা-লক্ষণা'ও বলা হয়। দৃষ্টান্তসহ প্রতিটি লক্ষণা ব্যাখ্যা করা গেল।

(১) জহৎলক্ষণা বা জহৎস্বার্থা লক্ষণা

জহৎলক্ষণা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট বলেছেন, 'যত্র বাচ্যার্থস্য অন্বয়াভাবঃ তত্র জহৎলক্ষণা', অর্থাৎ **'যেখানে পদের বাচ্যার্থের (শক্যার্থের) সঙ্গে বাক্যের অন্তর্গত অন্য পদের অন্বয় (মিল) সম্ভব হয় না, সেখানে জহৎলক্ষণা হয়।** দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্নংভট্ট 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' এই বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। এখানে বাক্যের অন্তর্গত 'মঞ্চ' পদে জহৎলক্ষণা হয়েছে। 'মঞ্চ' শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ বা শক্যার্থ হল 'মাঁচা' এবং 'ক্রোশন্তি' শব্দের অর্থ 'ক্রোশ প্রদর্শন পূর্বক চীৎকার করা'। 'মঞ্চ' শব্দটির সাক্ষাৎ অর্থ 'মাঁচা' এক প্রাণহীন জড়পদার্থ, যা কখনো চীৎকার করতে পারে না। চীৎকার করা প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব। স্পষ্টতই, বাক্যের অন্তর্গত 'মঞ্চ' শব্দের সাক্ষাৎ অর্থের সঙ্গে অর্থাৎ বাচ্যার্থের সঙ্গে অপর শব্দ 'চীৎকার'-এর অন্বয় হয় না। কাজেই, 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' এই বাক্যটিকে অর্থপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হলে 'মঞ্চ' শব্দটির সাক্ষাৎ অর্থ (বাচ্যার্থ) **সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ** করে অসাক্ষাৎ অর্থটি গ্রহণ করতে হবে। অসাক্ষাৎ অর্থটি হবে 'মঞ্চে অবস্থিত মানুষ'। তাহলে, বাক্যটির অর্থ হবে, 'মাঁচায় অবস্থিত মানুষ চীৎকার করে', যা বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। তাহলে জহৎলক্ষণা প্রসঙ্গে বলা চলে, **যে স্থলে বাক্যস্থ পদসমূহের অন্বয় সাধনের জন্য কোন পদের বাচ্যার্থ (শক্যার্থ) সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়ে লক্ষ্যার্থ গৃহীত হয়, সেই স্থলে জগৎলক্ষণা হয়।**

(পূর্বে উল্লিখিত) **'গঙ্গায়াং ঘোষ' এই বাক্যেও 'গঙ্গা' পদে জহৎলক্ষণা হয়।** বাক্যটিকে অর্থপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হলে বাক্যস্থ 'গঙ্গা' শব্দের বাচ্যার্থ বা শক্যার্থ যে 'জলপ্রবাহ' তাকে **সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ** করে শব্দটির অসাক্ষাৎ লাক্ষণিক অর্থ 'তীর'কে বুঝতে হয়। এমন ক্ষেত্রে 'গঙ্গায়াং ঘোষ'ঃ, এই বাক্যটির অর্থ হয়, 'ঘোষপল্লী গঙ্গা-তীরে অবস্থিত', যা আমাদের সবার কাছে বোধগম্য। এক্ষেত্রেও লক্ষণাটি হল জহৎলক্ষণা, কেননা বাক্যটিকে অর্থপূর্ণ করার জন্য 'গঙ্গা' শব্দের বাচ্যার্থকে (জলপ্রবাহকে) সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করে লক্ষ্যার্থকে গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) অজহৎলক্ষণা বা অজহৎ-স্বার্থা-লক্ষণা

অজহৎ লক্ষণা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'বাচ্যার্থস্য অপি অন্বয়ঃ, তত্র অজহৎ ইতি', অর্থাৎ 'যেখানে পদের বাচ্যার্থের (শক্যার্থের) সঙ্গে বাক্যের অন্তর্গত অন্য পদের অন্বয় (মিল) সম্ভব হয়, সেখানে অজহৎলক্ষণা হয়। অন্যভাবে বলা চলে, **'যে স্থলে পদের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ, উভয়বিধ অর্থ গৃহীত হয়, সেস্থলে অজহৎলক্ষণা হয়।'** এক্ষেত্রে শব্দের বাচ্যার্থ

বা শক্যার্থ পরিত্যক্ত না হয়ে লক্ষণা হয়, অর্থাৎ অসাক্ষাৎ লাক্ষণিক অর্থটি সাক্ষাৎ অর্থকে পরিত্যাগ করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্নংভট্ট 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। 'ছত্রিণো' অর্থে 'ছত্রধারী ব্যক্তি', 'গচ্ছন্তি' অর্থে 'গমন করা' বা 'যাওয়া'। দূর থেকে কোন ব্যক্তি একদল রথ-বাহিত-ছত্রী, গজবাহি, অশ্বারোহী, পদাতিক সেনাকে যেতে দেখে যখন বলেন, 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' তখন বাক্যস্থ 'ছত্রি' পদে অজহৎলক্ষণা হয়। এখানে 'ছত্রি' শব্দের দ্বারা কেবল বাচ্যার্থ 'ছত্রধারী' বোধিত হলে বাক্যের অন্তর্গত 'গচ্ছন্তি' শব্দটির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না, কেননা 'যাওয়া' ক্রিয়ার সঙ্গে রথবাহিত ছত্রিগণই কেবল যুক্ত নয়, গজবাহিত, অশ্ববাহিত, পদাতিক সেনাগণও যুক্ত। কাজেই, 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' বাক্যটির অর্থকে আংশিকভাবে প্রকাশ না করে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে হলে 'ছত্রি' শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ (শক্যার্থ) 'ছত্রকারী' এবং **ছত্রীদের সান্নিধ্যবশত** অসাক্ষাৎ অর্থ (লক্ষ্যার্থ) 'অছত্রধারী' (অশ্বারোহী ইত্যাদি)—উভয়কেই গ্রহণ করতে হবে। 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' বাক্যটির অর্থ হল, 'একদল সেনা যুদ্ধে যায় যাদের কিছু রথবাহিত ছত্রধারী, সবাই নয়।' কাজেই 'ছত্রি' অর্থে, 'ছত্রি-পদাতি-গজ-তুরগাদি ঘটিত এক সমুদায়' অর্থাৎ ছত্রি ও অছত্রি—ছত্রধারী এবং ছত্রহীন উভয়কেই বোঝায়। 'যাওয়া ক্রিয়াটি' (গচ্ছন্তি) ছত্রধারী ও ছত্রহীন উভয়ের দ্বারা সংঘটিত হওয়ায় এখানে 'ছত্রি' শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ শক্যার্থ এবং অসাক্ষাৎ লক্ষ্যার্থ—উভয় অর্থকেই গ্রহণ করতে হয় বলে 'ছত্রি' শব্দে অজহৎলক্ষণা হয়।

(৩) জহৎ-অজহৎ লক্ষণা বা জহৎ-অজহৎ-স্বার্থা লক্ষণা

জহৎ-অজহৎ-লক্ষণা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'যত্র বাচ্যৈক-দেশ-ত্যাগেন একদেশান্বয়ঃ, তত্র জহদজহদিতী', অর্থাৎ যেখানে **এক বাচ্যার্থ বা শক্যার্থের সঙ্গে অন্য বাচ্যার্থ বা শক্যার্থের অন্বয় (মিল) সম্ভব না হওয়ায় বাচ্যার্থ দুটির এক অংশ গ্রহণ ও অন্য অংশ বর্জন করতে হয়, সেখানে জহৎ-অজহৎ লক্ষণা হয়'**। অন্য ভাবে বলা যায়, 'যে লক্ষণাতে বাচ্যার্থের (শক্যার্থের) এক অংশ পরিত্যাগ করে অন্য অংশ গ্রহণ করা হয়, তাকে বলে জহৎ-অজহৎ লক্ষণা'। দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্নংভট্ট উপনিষদের 'তৎ-ত্বম্-অসি (তত্ত্বমসি) বাক্যটি উল্লেখ ক'রে, নৈয়ায়িক হয়েও, অদ্বৈতসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'তত্ত্বমসি', উপনিষদের এই মহাবাক্যটির অর্থ হল, 'তুমি হও সেই'। 'তৎ' অর্থে 'তুমি' অর্থাৎ 'জীবচৈতন্য' বা 'জীবাত্মা', আর 'ত্বম্' অর্থে 'সেই' অর্থাৎ 'পরমচৈতন্য' বা 'পরমাত্মা'। 'তৎ-ত্বম্-অসি' বাক্যটিতে জীবাত্মা (তৎ) ও পরমাত্মাকে (ত্বম) অভিন্ন বলা হয়েছে, কেননা 'তুমিই সেই' কথাটির এখানে অর্থ হল 'জীবাত্মাই পরমাত্মা", 'জীবচৈতন্যই পরমচৈতন্য'। কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার, খণ্ডচৈতন্য ও অখণ্ডচৈতন্যের, অল্পজ্ঞতা ও সর্বজ্ঞতার—এমন দুটি বিরুদ্ধ বিষয়ের অভেদ হতে পারে না, যেমন 'নীলঘট ও পীতঘট বিরুদ্ধ হওয়ায় তাদের অভেদ হতে পারে না।

'তত্ত্বমসি' উপনিষদের এই বাক্যটিকে বোধগম্য করার জন্য অদ্বৈত পণ্ডিতগণ বাক্যস্থ শব্দদুটি থেকে—'জীবাত্মা' (তৎ) ও 'পরমাত্মা' (ত্বম্) এই শব্দ দুটি থেকে—'জীব' ও 'পরম' এই বিশেষণ দুটি পরিত্যাগ করে অবশিষ্ট অংশের, 'আত্মা' বা 'চৈতন্য' এই অংশের অর্থ গ্রহণ করেছেন। বিশেষণ-বিরহিত শব্দ দুটি চৈতন্যমাত্রকে (বা শুদ্ধ আত্মাকে) বোধিত করে। যেমন,

(জীবচৈতন্য—জীব = চৈতন্য), তেমনি (পরমচৈতন্য—পরম = চৈতন্য)। এভাবে, শব্দদুটির সাক্ষাৎ অর্থের এক অংশ পরিত্যাগ করে এবং অন্য অংশ গ্রহণ করে তৎ এবং ত্বম্-এর মধ্যে অভেদ কল্পনা ক'রে বলা চলে, 'তৎ-ত্বম্-আসি'। অন্নংভট্টের মতে, বাক্যটির এপ্রকার অর্থবোধের ক্ষেত্রে 'তৎ' এবং 'ত্বম্' শব্দে জহৎ-অজহৎ-লক্ষণা হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, অন্নংভট্ট 'তত্ত্বমসি' বাক্যটিকে জহৎ-অজহৎ লক্ষণার দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করলেও **ব্যাখ্যাটি অদ্বৈতবেদান্তসম্মত হওয়ায় অনেক নৈয়ায়িক এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না এবং তাঁরা উপনিষদের 'তত্ত্বমসি'** বাক্যটিকেও **জহৎ-অজহৎ লক্ষণার** দৃষ্টান্তরূপে **গণ্য করেন না।** নৈয়ায়িকগণ **জহৎ-অজহৎ লক্ষণার দৃষ্টান্তরূপে 'সোঽয়ং দেবদত্ত', 'এই সেই দেবদত্ত', এই বাক্যটির উল্লেখ করেন।** দেবদত্ত নামক ব্যক্তিকে পূর্বে কাম্পিল্যতে দেখে পরে কাশীতে দেখলে আমাদের এমন বোধ হয় যে, বর্তমানদৃষ্ট ব্যক্তিই হল পূর্বদৃষ্ট ব্যক্তি। এরূপ বোধকে বলা হয় 'প্রত্যভিজ্ঞা'। এখানে 'সেই' শব্দের দ্বারা কাম্পিল্যতে দেখা দেবদত্তের স্মরণাত্মক জ্ঞান এবং 'এই' শব্দের দ্বারা বর্তমানে দৃষ্ট দেবদত্তের প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান বোধিত হয়। বাক্যটিতে পূর্বাপর এ-দুটি জ্ঞানকে অভেদরূপে গণ্য করা হয়েছে ; কিন্তু কাম্পিল্যতে দেখা দেবদত্তের সঙ্গে বর্তমান-দৃষ্ট দেবদত্তের অভেদ সম্ভব নয়, কেননা দুটি প্রত্যক্ষের পরিবেশ-স্থান-কালাদি—অভিন্ন নয়, তারা ভিন্ন ভিন্ন। বাক্যটিকে বোধগম্য করতে হলে বাক্যস্থ শব্দদুটি থেকে—'কাম্পিল্যস্থ দেবদত্ত' এবং 'কাশীস্থ দেবদত্ত', এই শব্দ দুটি থেকে—'কাম্পিল্যস্থ' এবং 'কাশীস্থ' এই বিশেষণ দুটি পরিত্যাগ করে অবশিষ্ট অংশের, 'দেবদত্ত' অংশের অর্থ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষণ-বিরহিত শব্দ দুটি কেবলমাত্র **দেবদত্তকে** বোধিত করে। যেমন, 'কাম্পিল্যস্থ দেবদত্ত—কাম্পিল্যস্থ = দেবদত্ত ; তেমনি কাশীস্থ দেবদত্ত—কাশীস্থ = দেবদত্ত। এভাবে, শব্দদুটির সাক্ষাৎ অর্থের এক অংশ পরিত্যাগ করে এবং অন্য অংশ গ্রহণ করে 'এই' এবং 'সেই'-এর মধ্যে অভেদ কল্পনা করে বলা চলে, 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ', 'এই সেই দেবদত্ত'। ন্যায় মতে, বাক্যটির এইপ্রকারে অর্থবোধের ক্ষেত্রে 'এই' এবং 'সেই' শব্দে জহৎ-অজহৎ-লক্ষণা হয়।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, সকল নৈয়ায়িক জহৎ-অজহৎ লক্ষণা স্বীকার করেন না। এঁদের মতে, লক্ষণা দুপ্রকার—জহৎলক্ষণা বা জহৎ-স্বার্থা লক্ষণা এবং অজহৎ লক্ষণা বা অজহৎ-স্বার্থা লক্ষণা।

❑ ৭.৬. গৌণীবৃত্তি

তর্কদীপিকা ঃ গৌণ্যপি লক্ষণৈব লক্ষ্যমাণ-গুণ-সম্বন্ধরূপা। যথা—অগ্নির্মাণবক ইতি।

৭.৬. ব্যাখ্যা ঃ অনেকে 'শক্তি ও 'লক্ষণা'র মতো শব্দের অপর এক বৃত্তির, **গৌণী-বৃত্তির,** উল্লেখ করেন। এঁদের মতে, শব্দের দুটি মাত্র বৃত্তি নয়, 'গৌণী' নামক এক অতিরিক্ত বৃত্তিও আছে। এই গৌণীবৃত্তি হল, **'লক্ষ্যমাণ (শক্যবৃত্তি) গুণের সম্বন্ধ স্বরূপ'**। যেমন,—'অগ্নির্মাণবক'— 'তরুণ পণ্ডিতটি অগ্নি'। এখানে অগ্নি ও মানবকের অভেদ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ হওয়ায় বক্তা অবশ্যই মানবককে অগ্নিরূপে চিহ্নিত করেননি। অগ্নিরূপ উষ্ণ জড় দ্রব্যের সঙ্গে চেতন মানবকের (তরুণ পণ্ডিতের) অভেদ কখনও বক্তার অভিপ্রেত হতে পারে না। তবে,

মানবকটির **মধ্যে, অগ্নির মতো, তেজস্বিতা, শুচিতা, দীপ্তি প্রভৃতি প্রকটিত হয় বলেই** 'অগ্নি **সদৃশ মাণবক', এই অর্থেই বক্তা** 'অগ্নির্মানবক' **বলেছেন।**

'অগ্নির্মানবক'—'এই তরুণ পণ্ডিতটি অগ্নি' বাক্যটির অর্থ 'অগ্নি-সদৃশ মানবক'-এভাবে গ্রহণ করলে, 'অগ্নি-সদৃশ' **অর্থটিকে 'অগ্নি' শব্দের 'শক্যার্থ' অথবা 'লক্ষ্যার্থ'রূপে গণ্য করা যাবে না,** অতিরিক্ত এক অর্থরূপে, 'গৌণী' অর্থরূপে, গণ্য করতে হবে—**গুণ সম্বন্ধে উক্ত হওয়ায় অর্থটিকে বলা হয় 'গৌণী অর্থ', এবং বৃত্তিটিকে বলা হয়** 'গৌণীবৃত্তি'। 'অগ্নির্মানবক' = 'অগ্নি-সদৃশ মানবক', এমন বললে, সেক্ষেত্রে 'অগ্নি' শব্দটি শক্তি-দ্বারা 'অগ্নি-সদৃশ' অর্থকে নির্দেশ করতে পারে না, কেননা ঐ অর্থে, 'সাদৃশ্য' অর্থে, শব্দটির শক্তি থাকে না। শক্তি দ্বারা বোধিত 'অগ্নি' শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ বা শক্যার্থ হল, 'প্রজ্জ্বলিত অগ্নি' এবং মানবকটিকে এই অর্থে 'অগ্নি' বলা চলে না। 'অগ্নি' শব্দের অসাক্ষাৎ লাক্ষণিক অর্থ বা লক্ষ্যার্থ হল, অগ্নির সঙ্গে যুক্ত 'উষ্ণতা', এবং মানবকটিকে এই অর্থেও 'অগ্নি' বলা চলে না। তথাপি, অগ্নির্মানবক' বলতে যদি বোঝায় 'অগ্নি-সদৃশ মানবক'—'মানবকটির তেজস্বিতা, শুচিতা প্রভৃতি গুণগুলি অগ্নির গুণ-সদৃশ', তাহলে বাক্যটি অর্থহীন হয় না, অর্থপূর্ণ হয়। **বাক্যটিকে অর্থপূর্ণরূপে বোধগম্য করার জন্য এখানে তাই শক্তি ও লক্ষণা অতিরিক্ত গৌণীবৃত্তি স্বীকার করতে হয়। মীমাংসকগণ** এমন অভিমত পোষণ করে বলেন, শব্দের এপ্রকার অর্থ সাক্ষাৎ না হওয়ায় তা শক্যার্থ নয় ; আবার, অসাক্ষাৎ হলেও তা লক্ষণার দ্বারা বোধিত অর্থ নয় ; এ হল শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ থেকে ভিন্ন এক স্বতন্ত্র অর্থ—গৌণী অর্থ।

অন্নংভট্ট উপরি-উক্ত মতের বিরোধিতা করে গৌণী-বৃত্তিকে নিষ্প্রয়োজনীয় বলেছেন। **অন্নংভট্টের মতে, গৌণী-বৃত্তি স্বতন্ত্র কোন বৃত্তি নয়, তা লক্ষণারই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ গৌণীবৃত্তি লক্ষণাই।** শক্য-সম্বন্ধকে 'লক্ষণা' বলা হয়। শক্য হল শক্যার্থ বা শক্তির দ্বারা বোধিত সাক্ষাৎ অর্থ। **শক্য-সম্বন্ধকে** যদি 'লক্ষণা' বলা হয়, তাহলে অন্নংভট্টের অভিমত হল, গৌণীবৃত্তিকেও লক্ষণারূপে গণ্য করতে হয়। শক্য-সম্বন্ধ অর্থাৎ শক্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ কখনো সাক্ষাৎসম্বন্ধ হতে পারে, আবার কখনো অসাক্ষাৎ সম্বন্ধ হতে পারে। এখানে 'সাক্ষাৎ' অর্থে **'পরম্পরা',** আর 'অসাক্ষাৎ' অর্থে **'পরম্পরা-পরম্পরা'**। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই বাক্যে লক্ষণা হল 'তীর' এবং তীর জলপ্রবাহের সঙ্গে সান্নিধ্য সম্বন্ধে যুক্ত থাকায় 'গঙ্গা' শব্দটি 'তীর'কে বোধিত করলে তা হয় **পরম্পরা** সম্বন্ধে অর্থ—'গঙ্গা' শব্দটি প্রথমে 'জলপ্রবাহ'কে এবং পরে জলপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত 'তীর'কে বোধিত করে। কিন্তু 'অগ্নির্মাণবক' বললে 'অগ্নি' **শব্দটি** প্রথমে 'প্রজ্বলিত অগ্নিকে', পরে অগ্নির ধর্ম (গুণ) 'তেজস্বিতা' 'শুচিতা', 'দীপ্তি' ইত্যাদিকে বোধিত করে, এবং **তৎপরে** সেইসব ধর্ম বা গুণ **সদৃশ ধর্ম** বা গুণ মানবকে অর্পিত হয়। এখানে সম্বন্ধটি হল **পরম্পরা-পরম্পরা।** 'অগ্নির্মাণবক'—'তরুণ পণ্ডিতটি অগ্নি-সদৃশ' কথাটির অর্থ হল, 'অগ্নির মধ্যে যেসব গুণ দেখা যায়, মানবকটির মধ্যে সেইসব **গুণ-সদৃশ গুণ** প্রকটিত হয়'। কাজেই এক্ষেত্রেও 'অগ্নি' শব্দে লক্ষণাই হয়। গৌণী-বৃত্তি লক্ষণারই অন্তর্ভুক্ত। শক্তি ও লক্ষণা অতিরিক্তভাবে গৌণী-বৃত্তি স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। গৌণীকে অতিরিক্ত বৃত্তিরূপে গণ্য করলে গৌরব (দোষ) হয়, লক্ষণার অন্তর্ভুক্ত করলে লাঘব (গুণ) হয়।